OPEN ACCESS
IF 8.111

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 45
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 345 - 352
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 345 - 352
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

উনিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে কৃষক সমাজের সংকট, অসন্তোষ ও বিদ্রোহ

অদিতি রায়
বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: aditiroy.a2019@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Peasant Insurrection, Peasant Discontent, Agrarian Crisis, Bengali Novels of 19th Century, Zamindar Class, Middle Class intelligentsia, Class Conflict.

Abstract
The colonial economy ultimately marginalized the peasantry in India, a country fundamentally rooted in agriculture. At the same time, it took nearly until the middle of the twentieth century for Bengali civil society to bring that very peasantry into the mainstream and transform it into a crucial instrument of the nationalist freedom movement. Naturally, literature reflected the consciousness of the educated Bengali mind. Both the writers and the readers largely belonged to the so-called bhadralok (respectable middle-class). As a result, throughout the long nineteenth century, the number of Bengali novels that centered on the severe agrarian crisis remained extremely limited. Not only in novels but in almost all literary forms, the problems of the peasantry largely remained neglected during this period.

Certain distinct tendencies can be observed in the novels that addressed the agrarian crisis, along with essays, plays, and newspaper reports. Among these tendencies were writers' blind loyalty toward the British rulers and zamindars, class inequality, and a sympathetic attitude toward the so-called lower-class peasants. Even those novels that attempted to reflect peasant problems often failed to present the agrarian crisis adequately. Except Lal Behari Dey's Govinda Samanta, hardly any novel placed small or middle peasants as the protagonist or central characters.

In reality, since both authors and readers belonged predominantly to the so-called upper classes, the literary sphere had not yet created a space attentive enough to hear the voices and sufferings of the peasantry. Moreover, most writers themselves came from the zamindar class or the educated urban middle class. As a result, very few were willing to take up their pens directly against the exploiting classes. The objective of this article is to identify and analyze these tendencies in the attitudes of the educated Bengali intelligentsia toward peasant life by examining a selection of Bengali novels written prior to the twentieth century. The central concern of this study is to explore how

nineteenth-century Bengali novels perceived and represented the agrarian crisis, peasant discontent, struggles and revolts in Bengal.

Discussion

উনিশ শতক বাংলার নবজাগরণের শতক উনিশ শতক। সামাজিক অনুশাসনের অন্ধ অনুকরণ ছেড়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রে ভাস্বরিত হওয়ার শতক। কিন্তু নবচেতনার উন্মেষের এই শতকেই মূলত ইংরেজি ও বিজ্ঞানে শিক্ষিত, কলকাতা-কেন্দ্রিক 'আধুনিক' বাঙালিমানস সমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করে। নবনির্মিত নাগরিক-মধ্যবিত্ত সমাজ তথা বাঙালি মণীষা খুঁজে পায় নিজস্ব শ্রেণি।

১৮৬৫-তে বাংলার প্রথম সার্থক উপন্যাস *দুর্গেশনন্দিনী-র* জন্ম। জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশের সাথে সাথে এর পর জন্ম নেবে একের পর এক ঐতিহাসিক উপন্যাস। কিন্তু কৃষকের কথা? বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ যে কৃষক জনসাধারণ – নিষ্পেষিত, নিঃশেষিত-সম্পদ অসহায় কৃষককুল, তাদের কথা উপন্যাসে জায়গা করে নিতে পারল কী সেভাবে? অথচ আঠেরো উনিশ শতকের বঙ্গদেশে কৃষক সংকট এক জ্বলন্ত সমস্যা। বিভিন্ন আঞ্চলিক বিদ্রোহ-সহ লাগাতার নীল বিদ্রোহ ছিল বাংলার চিরস্থায়ী ঘটনা। ব্রিটিশ শাসকের লুণ্ঠনে, সম্পদের নির্গমনে, অবশিল্পায়নে, খাজনায় ও দাদনে বুভুক্ষু ভারতবর্ষে ১৭৫৭-র পলাশির যুদ্ধের পর থেকে ১৯০১ অবধি ঘোষিত দুর্ভিক্ষের সংখ্যা ছিল ২৭ এবং ১৮৫৪ থেকে ১৯০১ – এই সাতচল্লিশ বছরে ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত হিসাবে দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৮৮ লক্ষ ২৫ হাজার।[১]

কৃষকের এই দুরাবস্থার ইতিহাস ধারণ করে আছে মূলত ১৭৯৩-এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। ঔপনিবেশিক শাসনে ও শোষণে ভারতবর্ষের প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর জমিদার ও কৃষকের সম্পর্ক গেল বদলে। জমির অধিকার থেকে সম্পূর্ণরূপে কৃষকই শুধু বঞ্চিত হল না, যথাক্রমে পাঁচসালা, একসালা, দশসালা ও শেষাবধি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে পুরোনো জমিদার পরিবারগুলিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ধ্বংস হল। সরকারকে নির্দিষ্ট কর প্রদানের দ্বারা নব্য ধনীরা পেলেন জমির মালিকানা। ফলত মোঘল আমলের ব্যবস্থার কৃষকই জমির মালিক - এই রূপরেখা বদলে এখন জমিদারই হয়ে উঠলেন জমির মালিক ও শোষক। তৈরি হল অনুপস্থিত জমিদার এবং অজস্র মধ্যস্বত্বভোগী। খাজনার বিপুল চাপে নিঃস্ব কৃষককুল ক্রমে পরিণত হল ভূমিদাসে। একইভাবে বস্ত্রশিল্প-সহ কৃষিজাত বিভিন্ন কুটিরশিল্পগুলিও ধ্বংস হল ঔপনিবেশিক নীতির জাঁতাকলে। চরম শোষণে খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকার মতো অবস্থাটুকুও রইল না গ্রামবাংলার সর্বহারা কৃষকের। আদিম উপজাতিগুলি যাদের জীবনও কোনো না কোনো ভাবে কৃষিনির্ভর তাদের উপরেও একই সংকট নেমে এল। অভিযোগ জানানোর মতো, সুরাহা মেলার মতো কোনো পথ খোলা রইল না অত্যাচারিত এই কৃষক তথা সাধারণ প্রজার কাছে। রক্ষকই যখন ভক্ষক, তখন দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার মতো অবস্থায় তাদেরকে বাধ্য হয়েই ঘুরে দাঁড়াতে হল। মোঘলযুগে কৃষক বিদ্রোহের খোঁজ যে ইতিহাসে মেলে না, তা নয় কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনের বাংলা আঠেরো উনিশ শতক জুড়ে বারংবার কৃষক বিক্ষোভ ও বিপ্লবে ফেটে পড়ল। বিদ্রোহগুলির প্রত্যেকটিই ছিল বিচ্ছিন্ন, আঞ্চলিক, যথাযথ পরিকল্পনাবিহীন এবং সর্বোপরি সুসংগঠিত, আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত ইংরেজ সৈন্যের বিরুদ্ধে অসম লড়াই, দুঃসাহসিক সংগ্রাম। তাই সন্ন্যাসী বিদ্রোহ থেকে শুরু করে চাকমা বিদ্রোহ, মালঙ্গীদের সংগ্রাম, রেশম চাষিদের সংগ্রাম, নায়েক বিদ্রোহ, চোয়াড় বিদ্রোহ, গারো বিদ্রোহ, পাগলাপন্থী বিদ্রোহ, সন্দ্বীপের বিদ্রোহ, ওয়াহাবি আন্দোলন, ফরাজি আন্দোলন, সাঁওতাল বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ এবং নীল বিদ্রোহ প্রভৃতি সবই কঠোর হাতে দমন করেছে ব্রিটিশ শোষক তথা শাসক। কিন্তু আঠেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে শুরু হওয়া এবং গোটা উনিশ শতক জুড়ে চলা এই বিদ্রোহগুলি নিয়ে লিখিত উপন্যাসের সংখ্যা হাতে গোণা! অথচ তখন সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হতে পারত এই জ্বলন্ত কৃষক সমস্যা।

কৃষক জীবনের সংকট, তাদের অসন্তোষ এবং প্রতিরোধ – এই বিষয়ে সেই সময়ে লিখিত যেকোন সাহিত্য নিদর্শন খুললে চমৎকৃত হতে হয় বাঙালি মনীষার দৃষ্টিভঙ্গি দেখে। প্রবন্ধ সাহিত্য, নাটক বা উপন্যাস - যতটুকু নিদর্শনই পাওয়া যাক সেখানে কৃষক সংগ্রামকে শুধু ব্রাত্য করেই দেখা হয়নি, দেখা হয়েছে ভূম্যাধিকারী বা বড় চাষিদের সংকটের দৃষ্টিকোণ থেকে। *সংসঙ্গ* -র মতো কিছু ব্যতিক্রমী সংবাদপত্র ছাড়া সমস্ত সরকারি বা সরকার পৃষ্ঠপোষিত হিন্দী ও বাংলা

সংবাদপত্রগুলি ইংরেজ সরকার ও জমিদারের হয়ে সোচ্চারিত হয়েছে, শাসকের বিরোধিতা দূরে থাক, নীলসংগ্রাম ছাড়া সমস্ত কৃষি বিদ্রোহকে নাগরিক সমাজের চোখে অসভ্য জাতির উৎপাত হিসেবে চিহ্নিত করে প্রতিবেদন পেশ করেছে তৎকালীন বুদ্ধিজীবি সমাজ।

১৮৮৫-র পর কংগ্রেসি রাজনীতি নিজ প্রয়োজনে আপামর কৃষক জনসাধারণকে আন্দোলনের বাহক হিসাবে কাজে লাগালেও দলগত ভাবে তারা থেকেছে জমিদারশ্রেণির কুক্ষিগত হয়ে। ১৯১৭য় রুশ বিপ্লবের পর পৃথিবী জুড়ে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ প্রসারের ফলে দেশীয় বামপন্থী দলগুলি কৃষক সমাজের কথা ভাবল বটে তবে ততদিনে পেরিয়ে গেছে দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধ। ফলে রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় তেভাগা, নকশাল বা বর্গার মতো আন্দোলন গড়ে উঠতে সময় গড়িয়ে গেল প্রায় বিশ শতকের মধ্যভাগ। কৃষকসমাজের সমস্যা, সংকট, যন্ত্রণা, অসন্তোষ ও সংগ্রামও তাই সাহিত্য সার্থক ভাবে ধারণ করল বিশ শতকের প্রায় তৃতীয় দশকে গিয়ে। কৃষকবিদ্রোহ থেকে কৃষক আন্দোলনের যাত্রাপথের প্রেক্ষাপটটির দলিল হিসাবে বাংলা সাহিত্য তাই তেমন নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠতে পারল না উনিশ শতকে। বরং উনিশ শতকের গুটিকয়েক উপন্যাস-সহ অন্যান্য সাহিত্য সংরূপ কৃষকসমাজের যে চিত্র চিত্রায়িত করল, তা বেশ কিছু সাধারণ প্রবণতায় মন্ডিত হয়ে একপেশে হয়ে রইল ঐতিহাসিক আখ্যান হিসেবে। বর্তমান প্রবন্ধে উনিশ শতকের কৃষক সংকট ও সংগ্রাম বিষয়ক সেই স্বল্পসংখ্যক উপন্যাসগুলি থেকে নির্দিষ্ট প্রবণতাগুলিকে চিহ্নিত করে তা বিশ্লেষণ করে আলোচনা করা হল। রমেশচন্দ্র দত্তের *বঙ্গবিজেতা* ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের *ফুলজানি* যথাক্রমে টোডরমল এবং সিরাজদৌল্লার আমলের কৃষক সংকটের পরিচয় দেয়। তবে আলোচ্য বিষয় ঔপনিবেশিক পর্বের কৃষক বিদ্রোহের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ায় নির্বাচিত উপন্যাসগুলি হল-

১। টেকচাঁদ ঠাকুর – *আলালের ঘরের দুলাল* (১৮৫৮)
২। লালবিহারী দে – *Bengal Pesant Life* বা *The History of a Bengal Raiyat* বা *গোবিন্দ সামন্ত* (১৮৮৩)
৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – *আনন্দমঠ* (১৮৮২)
৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – *দেবী চৌধুরাণী* (১৮৮৪)
৫। চণ্ডীচরণ সেন – *মহারাজা নন্দকুমার* (১৮৮৫)
৬। চণ্ডীচরণ সেন – *দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ* (১৮৮৬)
৭। চণ্ডীচরণ সেন – *ঝাঁসির রাণী* (১৮৮৮)
৮। মীর মশারফ হোসেন – *উদাসীন পথিকের মনের কথা* (১৮৯০)
৯। প্রবোধচন্দ্র সরকার – *শালফুল* (১৮৯৩)

উপন্যাসগুলির নির্দিষ্ট প্রবণতা বা ঝোঁক :

ক। ব্রিটিশ শাসকের প্রতি মুগ্ধতা ও আনুগত্য : উনিশ শতকের কৃষক সংকট ও সংগ্রাম কেন্দ্রিক উপন্যাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা না করা। শিক্ষিত বাঙালির কাছে ইংরেজ ছিল আদর্শ শাসক। বিশেষ করে হিন্দু জাতীয়তাবাদী মনোভাব প্রসারের কারণে তো বটেই ব্রিটিশদের তারা ভারতবর্ষের রক্ষক হিসেবে ভাবতে দ্বিধা করেনি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বয়ং তাঁর *বঙ্গদেশের কৃষক* প্রবন্ধে লিখছেন, -

> “ব্রিটিশ অধিকারে রাজ্য সুশাসিত।”[২]

তিনি অবশিল্পায়নের তত্ত্বও নাকচ করেছেন এই প্রবন্ধে। সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ পরিচালিত হয়েছিল যেসব সন্ন্যাসী ও ফকির দ্বারা তারা ছিলেন মূলত পেশাগত ভাবে কৃষক। ইংরেজ শাসক এদের দলবদ্ধ ভাবে তীর্থভ্রমণকেও শোষণের একটি ক্ষেত্রে পরিণত করে মাথাপিছু বিভিন্ন প্রকারের কর ধার্য করে বিপুল পরিমাণ লুন্ঠন করতে থাকে। কৃষকদের ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হলে তা দমন করতে ওয়ারেন হেস্টিংস তাদের ‘ডাকাত’ আখ্যা দিয়ে ফাঁসি দিতে শুরু করলে বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে বিদ্রোহে পরিণত হয়। কিন্তু সন্ন্যাসী অভ্যুত্থানের এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে লিখিত উপন্যাস *আনন্দমঠ*-এ পরিণত হয়েছে মূলত মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুদের ধর্মসংগ্রামে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন, -

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 45
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 345 - 352
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "সাহেব, ... তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, হিন্দু মোছলমান মারামারি হইতেছে, তোমরা মাঝখানে কেন? আপনার ঘরে ফিরিয়া যাও।"[৩]

অষ্টম অধ্যায়ে শেষ দৃশ্যেও চিকিৎসক ও সত্যানন্দের যে সংলাপ সেখানেও দেখা যায়, চিকিৎসক বলছেন, -

> "তোমার কার্য সিদ্ধ হইইয়াছে, মুসলমান রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে। আর তোমার এখন কোন কার্য নাই। অনর্থক প্রাণিহত্যার প্রয়োজন নাই।"[৪]

সত্যানন্দ তাতে উত্তর করেন, -

> "মুসলমান রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হয় নাই - এখনও কলিকাতায় ইংরেজ প্রবল। ...এখন ইংরেজ রাজা হইবে।"[৫]

ঔপ্যনাসিক আখ্যানের মধ্য দিয়ে সামাজিক শিক্ষা দেন। চিকিৎসকের মুখ দিয়ে তিনি পাঠককে জানান, -

> "সনাতন ধর্মের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে, আগে বহির্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার করা আবশ্যক। এখন এদেশে বহির্বিষয়ক জ্ঞান নাই - শিখায় এমন লোক নাই; আমরা লোকশিক্ষায় পটু নহি। অতএব ভিন্ন দেশ হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে। ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপন্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব। ... ইংরেজ রাজ্যে প্রজা সুখী হইবে- নিষ্কণ্টকে ধর্মাচারণ করিবে। অতএব হে বুদ্ধিমান- ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া আমার অনুসরণ কর।"[৬]

শাসকের অনুগত থাকার যে বার্তা এই উপন্যাস দেয় তা আধুনিক সমালোচকের চোখে পীড়াদায়ক। চিকিৎসকরূপী মহাপুরুষ চরিত্রের মুখ দিয়ে বঙ্কিম আরও বলান, -

> "শত্রু কে? শত্রু আর নাই। ইংরেজ মিত্ররাজা। আর ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে শেষ জয়ী হয়, এমন শক্তি কাহারও নাই।"[৭]

'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪) তে এই ঔপ্যনাসিক গ্রামবাংলার দস্যুভীতি বর্ণনা করতে গিয়ে অরাজক দেশকাল সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, -

> "তখন দেশ অরাজক। মুসলমানের রাজ্য গিয়াছে; ইংরেজের রাজ্য ভাল করে পত্তন হয় নাই- হইতেছে মাত্র। তাতে আবার বছর কত হইল, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর দেশ ছারখার করিয়া গিয়াছে। তার পর আবার দেবী সিংহের ইজারা।"[৮]

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ঔপনিবেশিক শোষণেরই চরম ফলাফল, দেবী সিংহের নৃশংস অত্যাচার ও অমানুষিক শোষণও হেস্টিংসের সহযোগিতায় ব্রিটিশ শাসকের অনিঃশেষ অর্থলোলুপতায় অনুষ্ঠিত। অথচ এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বোঝানো হল ইংরেজ শাসনের সূচনায় দেশের অবস্থা ছিল করুণ। আখ্যানে ভবানী পাঠক প্রফুল্লের কাছে দেশের যে দুরাবস্থার বর্ণনা করলেন তাতেও ভূম্যাধিকারী ও কাছারির কর্মচারিদেরকেই অত্যাচারী বলে বর্ণনা করা হল। হরবল্লভ দেবীসিংহকে পাওনা টাকা দিতে না পারায় দেবী চৌধুরাণী সেই পঞ্চাশ হাজার টাকা পরিশোধ করেন। ভবানী পাঠক দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের রীতি প্রফুল্লকে শিক্ষা দিলেন বটে কিন্তু সরাসরি দেবীসিংহ বা ইংরেজের বিরুদ্ধতা কখনোই উপন্যাস জুড়ে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের প্রধান দুই ঐতিহাসিক নেতৃত্বকে করতে দেখা গেল না।

লালবিহারী দে যখন গোবিন্দ সামন্ত (১৮৮৩) লিখছেন তখন তিনি কৃষক জীবনের সংকট তুলে ধরতে প্রয়াসী। এটিই একমাত্র উপন্যাস যেখানে জমিদারি শোষণ কীভাবে কৃষক গোবিন্দ সামন্তকে তাঁর বংশানুক্রমিক সচ্ছল অবস্থা থেকে একেবারে কর্পদকশূন্য অবস্থায় নিয়ে গেল তার ধারাবাহিক বিবরণ যথেষ্ট সার্থক ভাবে তুলে ধরেছে। কিন্তু ব্রিটিশদের চোখে অসহায় কৃষকদের দুর্দশা তুলে ধরাই তার উপন্যাসের অন্যতম উদ্দেশ্য তাই সরাসরি সরকার বিরোধিতা এই লেখাতেও অনুপস্থিত। আখ্যানে চাষিদের মুখ দিয়ে তিনি বলান, তারা কোম্পানি বাহাদুরকে খাজনা দেবে কিন্তু আর কোন মধ্যবর্তী কর্মচারিকে দেবে না। তাছাড়া দুর্গানগরের তরুণ জমিদার নবকৃষ্ণ মুখার্জিকে দেখানো হচ্ছে কৃষকদের প্রতি সহৃদয়। তিনি যে এই দরিদ্র কৃষকদের দুঃখ বোঝেন এইজন্য উপন্যাসে লালবিহারী দে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছেন ব্রিটিশদের,

বাঙালি তরুণদের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। কারণ তাঁর মতে, নবকৃষ্ণ মুখার্জি হিন্দু কলেজে পড়ে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষালাভ না করলে এত দয়ালু হতে পারতো না।

মীর মশারফ হোসেন *উদাসীন পথিকের মনের কথা* (১৮৯০) নীলবিদ্রোহ কেন্দ্রিক আখ্যান হিসাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে থাকবে অন্তত একটি বিশেষ কারণে - এখানে গঙ্গার বুকে ভেসে চলা লাট বাহাদুরের স্টিমারের সঙ্গে, দুই তীর ধরে দৌড়তে থাকা সহস্রাধিক কৃষকের জমায়েতের ঐতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করা আছে। অত্যাচারী নীলকর কেনীর বিরুদ্ধে জমিদার প্যারীসুন্দরীর লড়াইকে মহিমান্বিত করা হয়েছে। কিন্তু ইংরেজ বন্দনাও বাদ থাকেনি আখ্যানে। প্যারীসুন্দরীর পিতার জমিদারি বিষয়ে বলা হচ্ছে, -

> "তাঁহারও পৈতৃক জমিদারী নহে। ইহাও ইংরেজের অনুগ্রহেই হইয়াছিল। তাহারাও ইংরেজ, কেনীও ইংরেজ, একপ্রাণী বটে, - তবে, - মানুষ আর শূকর। এক ঝাড়ের বাঁশ – কেহ হাড়ীর ঝাঁটা, কেহ পূজার ফুলের সাজী। কত ইংরেজ কত কার্য্যে এদেশে আসিতেছেন, কৈ কেনীর মত নররাক্ষস ত একটীও দেখি না। অনেককে দেবতা বলিয়া পূজা করিতে ইচ্ছা করে।"[৯]

অর্থাৎ লেখক কৃতজ্ঞতা দেখিয়েছেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতি যেহেতু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই দেশীয় নতুন জমিদারশ্রেণির স্রষ্টা ও পৃষ্ঠপোষক। লেখা হচ্ছে, -

> "কুমারখালির রেসমের কুঠীর কল্যাণেই পিতার এত ঐশ্বর্য, এত জমিদারী। ইংরেজ বাহাদুরের শুভদৃষ্টিতেই সুন্দরপুরের ঘরের সৃষ্টি।"[১০]

মোটের উপর মীর মশারফ হোসেন নীলকর সাহেব কেনীর অত্যাচার ও দুর্নীতি বিষয়ে এই আখ্যান রচনা করেছেন। অন্যান্য ইংরেজ সম্পর্কে তিনি নীরব। আবার বাঙালিদের তুলনায় ইংরেজদের বাণিজ্য ক্ষমতার প্রশংসাও তিনি করছেন। শুধু তাই নয়, এই উপন্যাসে আদালতে ভুল বিচারের জন্য ভাষা সমস্যা ও রায়তদের অশিক্ষাকেও দায়ী করা হয়েছে।

বরং চণ্ডীচরণ সেন তুলনামূলক ভাবে অনেক স্বচ্ছ দৃষ্টিতে ইংরেজ-রাজের বাণিজ্যনীতির সমালোচনা করে গেছেন তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে। তাঁর *দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ* (১৮৮৬) উপন্যাস *দেবী চৌধুরানী-র* দুই বছর পরে প্রকাশিত, সে হিসাবে বলা যায় প্রায় সমসাময়িক অথচ তাঁর উপন্যাসে ওয়ারেন হেস্টিংস, দেবী সিংহ সহ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব ও সম্পদ নির্গমন নীতির তীব্র সমালোচনা করা আছে। যদিও তিনি ফিলিপ ফ্রান্সিস, জেনেরল ক্লেবারিং, কর্নেল মন্‌সন্‌ প্রমুখকে এ দেশের শুভাকাঙ্ক্ষীর আসনে বসিয়েছেন।

খ। জমিদারশ্রেণির প্রতি আনুগত্য : উনিশ শতকীয় বাঙালি মানস দ্বিধাহীন ভাবে জমিদারশ্রেণিকে সমর্থন করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ – জমিদারের অনুকূলে তাঁরা লিখছেন। মধ্যস্বত্বভোগী ও মহাজনদের শোষক হিসাবে চিহ্নিত করলেও জমিদার শ্রেণিকে ভাল দেখানো বা জমিদারশ্রেণিকেও অত্যাচারিত দেখানোর প্রবণতা সাহিত্যে বেশি। অনেক ক্ষেত্রেই জমিদাররা যে ইংরেজের ব্যবস্থাপনায় সর্বস্বান্ত হয়েছেন তা ঠিক কিন্তু জমিদারদের কৃষকদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার দৃষ্টান্ত এত কম যে উপন্যাসগুলিকে জমিদারের প্রতি একপেশে বললে অত্যুক্তি হয় না। নাটকে এর সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হল দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'।

উপন্যাস হিসাবে দেবী চৌধুরাণীকে নিলে দেখা যায় জমিদার হরবল্লভ উপসংহারে নিজের ভুল বুঝতে পারছেন। প্রফুল্লের কথায় ব্রজেশ্বর পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে অতিথিশালা নির্মাণ করে আদর্শ জমিদারের ন্যায় আচরণ করছে। *বঙ্গদেশের কৃষক* -এ আদর্শ জমিদারের কাজ যে পুকুর খনন, বিদ্যালয়, অতিথিশালা ইত্যাদি স্থাপন ইত্যাদি তা বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন। *উদাসীন পথিকের মনের কথা* -তে নীলকরকে দোষি করা হলেও জমিদারকে অত্যাচারী বলা হয়নি। ইংরেজের বদান্যতায় প্রাপ্ত জমিদারিতে জমিদাররা ইংরেজের প্রতি কৃতজ্ঞ। কেনী অত্যাচারী হলেও জমিদার কিন্তু প্রজাদের প্রতি সদয়। লেখা হচ্ছে, -

> "একদিন প্রায় একশত প্রজা কাঁদিতে কাঁদিতে সুন্দরপুর উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের একমাত্র বল, ভরসা, আশ্রয়দাত্রী ও রক্ষাকর্ত্রী যাহাকে জানিত তাঁহার নিকট বলিতে লাগিল, "মা রক্ষা কর! এতদিন বাঁচাইয়াছ,

> এখন বাঁচাও! দুরন্ত বাঘের মুখ হইতে তোমার গরীব প্রজার প্রাণ বাঁচাও! ... তুমি মুখ তুলিয়া না চাহিলে আমাদের মুখের প্রতি একবার নজর করে এমন লোক জগতে আর কেহই নাই। মা! তুমিই আমাদের রক্ষা কর্তা! মা! তোমার এই অধম সন্তানদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা কর। দুরন্ত জালেমের হাত হইতে বাঁচাও।"[১১]

এই আবেদনের পর প্যারীসুন্দরী চাষিদের রক্ষা করতে অগ্রসর হয়ে ব্যর্থ হয়। কিন্তু বাস্তবে জমিদারকে ভরসা করার দিন ঔপনিবেশিক বাংলায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। অভাব অভিযোগ জানানোর মতো তাদের কেউ ছিল না বলেই তারা বার বার বিদ্রোহ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে।

এই বিষয়ে চণ্ডীচরণ সেন তাঁর *দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ* উপন্যাসে লিখছেন, -

> "বস্তুত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানি প্রাপ্তির পূর্বে এ দেশের জমিদারগণ আপন আপন রায়তদিগকে সন্তানের ন্যায় সস্নেহে প্রতিপালন করিতেন। রায়তগণও আপন আপন ভূম্যাধিকারীকে পিতার ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা করত।"[১২]

মহারাজা নন্দকুমার উপন্যাসে নন্দকুমারের দয়ালু চরিত্রের অনেক উদাহরণ রয়েছে। লেখা হচ্ছে, -

> "মহারাজ নন্দকুমার প্রকৃত দেশহিতৈষী না হইলেও দেশের অনেক লোক তাঁহাকে পরোপকারী ধার্মিক লোক বলিয়া জানিত।"[১৩]

গ। সহানুভূতির দৃষ্টিকোণ : অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর *পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরাবস্থা* প্রবন্ধে তাদের সহ্য ক্ষমতা সম্পর্কে লিখছেন,-

> "পরমেশ্বর তাহারদিগকে লোকাতীত তিতিক্ষা শক্তি প্রদান করিয়াছেন সন্দেহ নাই! উত্তপ্ত লৌহদন্ড হৃদয় মধ্যে প্রবেশিত হইলেও সেই দুর্জয় তিতিক্ষাকে পরাভব করিতে পারে না!"[১৪]

অর্থাৎ তাদের উপর পাশবিক অত্যাচারের বিষয়ে জেনে শিক্ষিত সমাজ বিস্মিত ও সমবেদনায় কাতর কিন্তু নিজেদের সাথে তুলনা করতে ও অবস্থার প্রকৃত পরিবর্তন করতে অপারগ। তাই তাদের ঈশ্বরপ্রদত্ত তিতিক্ষা কল্পনা করে নাগরিক মনীষা নিশ্চিন্ত। বঙ্কিমচন্দ্র *বঙ্গদেশের কৃষক* প্রবন্ধে লিখেছিলেন, -

> "তাঁতি খাইতে পায় না বলিয়া দেশের ধন কমিতেছে না।"[১৫]

আসলে লেখকরা শিক্ষিত 'বাবু' সমাজের প্রতিনিধি, যারা পড়ছেন তারাও তাই ফলে একদিকে কৃষকের প্রকৃত সংকট যেমন কিছুটা অধরা থেকে যাচ্ছে তেমন নিজ শ্রেণির বিরুদ্ধে কলম ধরা সম্ভব হয়নি প্রায় কারও পক্ষেই। শ্রেণিদ্বন্দ্বকে অস্বীকার করতেও তাঁরা পারেননি। শ্রেণিদ্বন্দ্ব তাই উনিশ শতকে অপসৃত হয়নি, বরং হয়েছে প্রকট। নতুন তৈরি মধ্যবিত্ত শ্রেণিও ক্রমশ ভুলেছে গ্রামীণ বাংলার কৃষিলগ্ন সংস্কৃতিকে। চাষের কাজ বা চাষি – ক্রমশ দূরে সরে গেছে ভদ্র সমাজের থেকে।

তাই চণ্ডীচরণ সেন তাঁর *মহারাজা নন্দকুমার* উপন্যাসে বড় ব্যবসায়ীদের উপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অত্যাচার দেখিয়ে লবণ শিল্প ও বস্ত্র শিল্পের সংকট দেখিয়েছেন। দেখাচ্ছেন কোম্পানির শোষনে ব্যবসায়ীর সন্তানদের কীভাবে প্রায় ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে হচ্ছে কিন্তু কোন ছোট কৃষকের কথা তো নেই-ই, ছোট শিল্পী বলতে একমাত্র আছে দরিদ্র রামা তাঁতির কথা যে অগ্রিম দাদন নেওয়া প্রতিরোধ করতে নিজের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কেটে ফেলেছে। এই ঘটনাটিও গোটা উপন্যাসে একবার মাত্র উল্লিখিত হয়েছে। তাঁর লেখা *ঝাঁসির রাণী* উপন্যাসেও রাণীর ব্যক্তিগত জীবন ও পারিবারিক বর্ণনা এত বেশি যে প্রজাদের সমস্যা উপেক্ষিত হয়ে পড়েছে।

প্রবোধচন্দ্র সরকারের *শালফুল* উপন্যাসে নায়েক বিদ্রোহের কারণ ইতিহাসের আকারে ভূমিকাতেই বলে নেওয়া হচ্ছে, এরপর আর কোথাও কৃষক সংকট বা সমস্যার চিহ্নমাত্র নেই। অচলসিংহ ও তার দলের বিদ্রোহীদের বীরগাথা চিত্রায়িত হয়েছে এবং একটি মিলনান্তক রোমান্টিক প্রেমের উপাখ্যানও দেখানো হয়েছে কাহিনীর মধ্যে দিয়ে। অচল সিংহ

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 45
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 345 - 352
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নিজেও ছিলেন ছত্র সিংহের সেনাপতি, তিনিই উপন্যাসের মূল চরিত্র, ফলে একেবারে নিম্নবিত্ত মানুষের সংকটটি অধরাই থেকে যাচ্ছে।

দেখা যাচ্ছে, নীলবিদ্রোহ অনেক উপন্যাসেই উপস্থাপিত হলেও সামগ্রিক ভাবে কৃষক সংকটের অভিঘাত উপন্যাস গুলি সহজে ধরতে পারেনি। কৃষকদের দুরাবস্থা বর্ণনা অনেক জায়গাতেই হয়েছে তবে তা সীমিত এবং উপরোক্ত প্রবণতাযুক্ত।

লালবিহারী দে'র *গোবিন্দ সামন্ত* -তে নীলকর সাহেব মিষ্টার মুরের বিরুদ্ধে তরুণ রাজা নবকৃষ্ণ ব্যানার্জি কৃষককুলকে সহায়তা করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তাতে জনৈক প্রবীণ নীলচাষি তাঁর সারাজীবনের নীল চাষের অভিজ্ঞতা থেকে গোবিন্দের কাকাকে জানাচ্ছে, -

> "It is always well for the jamidar to promise to assist us, but you will see that he will not be able to protect us, All topiwalas (hatmen, that is, Europeans) are brothers to each other. The magistrate and the judge will always decide in favour of their white-skinned brother."[১৬]

আরও বলা হচ্ছে, -

> "Mari Saheb is a merciless creature, like all indigo-planters provided he gets his indigo, he does not care whether poor husbandmen live or die. His only object is to make money, and then to go away to his native land."[১৭]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তরুণ রাজা নবকৃষ্ণের পিতাও জমিদার কিন্তু তিনি মুরের সাথে কোনো ঝামেলা চান না।

মহারাজ নন্দকুমার উপন্যাসে ঔপ্যনাসিক লিখছেন, -

> "কৃষক তুমি কোন্ আশায় কলিকাতা চলিয়াছ। তুমি দেশের অন্নদাতা হইলেও তোমাকে কেহই এক মুষ্টি অন্ন দিবে না। ঐ দেখ ধনীর গৃহের কুলকামিণীগণ স্বর্ণমুদ্রা অঞ্চলে বান্ধিয়া তন্ডুল ক্রয় করিবার নিমিত্ত কলিকাতা যাইতেছে। ইহার এক মুষ্টি অন্ন মিলিলেও মিলিতে পারে। ইহার সঙ্গে টাকা রহিয়াছে। কিন্তু বিনামূল্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারিগণ কাহাকেও একমুষ্টি অন্ন দিবে না। কৃষকগণ! তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও। তোমাদের পরমায়ু এবার নিশ্চয়ই শেষ হইয়াছে। তোমার এ সংসার পরিত্যাগ করাই ভাল। পরমেশ্বর তাহার অমৃত ক্রোড়ে তোমাকে স্থান প্রদান করিবেন। এ নরপিশাচ পরিপূর্ণ শ্মশান সদৃশ বঙ্গদেশে থাকিয়া তুমি কখন সুখ শান্তি লাভ করিতে পারিবে না।"[১৮]

প্রমথ চৌধুরী যে *রায়তের কথা* লিখেছিলেন তার সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন, -

> "প্রজাকে ছেড়ে দেব? তখন দেখতে দেখতে এক বড়ো জমিদারের জায়গায় দশ ছোটো জমিদার গজিয়ে উঠবে। রক্তপিপাসায় বড় জোঁকের চেয়ে ছিনে জোঁকের প্রবৃত্তির কোনো পার্থক্য আছে তা বলতে পারিনে। তুমি বলেছ, জমি চাষ করে যে জমি তারই হওয়া উচিত। কেমন করে তা হবে? জমি যদি পণ্যদ্রব্য হয়, যদি তার হস্তান্তরে বাধা না থাকে?"[১৯]

আসলে এটিই উনিশ শতকের কৃষক সংকটকে, শিক্ষিত শ্রেণির স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার মূল জায়গা। আলোচিত উপন্যাসগুলি যদি লক্ষ্য করা যায় তবে দেখা যাবে কোনো উপন্যাসই চাষির বয়ান থেকে লিখিত হয়নি। গোবিন্দ সামন্ত লেখার মধ্যে দিয়ে ইংরেজ সরকারেরই দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা চলছে যাতে তারা দরিদ্র কৃষকদের অত্যাচার ও শোষণ, বিশেষ করে নীল চাষ থেকে রেহাই দেয়। তুলনামূলক ভাবে এই উদ্যোগ প্রশংসনীয় বটে কিন্তু এই আবেদন নিবেদনে কোনো কাজ হয় না। যাঁরা দেখছেন, লিখছেন এবং যাঁরা পড়ছেন তাঁরা সবাই তুলনামূলক ভাবে সমাজের উচ্চকোটিতে বসে আছেন। তাই শ্রেণিদ্বন্দ্ব উনিশ শতকীয় সমাজে মেটেনা। তার জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হয় বিশ শতকের প্রায় তৃতীয় দশক অবধি যখন মূলত কাজী নজরুল ইসলামের সম্পাদনায় 'লাঙল', 'ধূমকেতু' র মতো পত্রিকার মাধ্যমে এক বাঁক বদল সূচীত হবে। ক্রমশ আসবেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। ততদিনে রাজনীতির ছত্রছায়ায় কৃষক বিদ্রোহ রূপান্তরিত হয়েছে সুসংবদ্ধ কৃষক আন্দোলনে। কংগ্রেসী আন্দোলন সফল করতে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে পথে

নেমেছে অসংখ্য কৃষক। বাংলার বুকে শিক্ষিত বাঙালি মণীষা ঝাঁপিয়ে পড়েছে তেভাগা থেকে নকশালের মতো কৃষক আন্দোলন পরিচালনায়। তার আগে উনিশ শতকীয় উপন্যাসে ঔপনিবেশিক বাংলার কৃষক সংকটের চিত্রটি আদতে অধরাই থেকে যায়।

Reference:

১. রায়, সুপ্রকাশ, *ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম,* র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশন, ২০১৮ পৃ. ৭৮
২. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম, ‘বঙ্গদেশের কৃষক’, *বাংলার জমিদার ও রায়তের কথা গ্রন্থ,* কমল চৌধুরী (সম্পা.) দে’জ পাবলিশিং, ২০১৯, পৃ. ১৬৪
৩. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম, *আনন্দমঠ,* শুভম, ২০০৯ পৃ. ৭৮৪
৪. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম, *আনন্দমঠ,* শুভম, ২০০৯ পৃ. ৮১৫
৫. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম, *আনন্দমঠ,* শুভম, ২০০৯ পৃ. ৮১৫
৬. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম, *আনন্দমঠ,* শুভম, ২০০৯ পৃ. ৮১৬
৭. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম, *আনন্দমঠ,* শুভম, ২০০৯ পৃ. ৮১৬
৮. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম, *আনন্দমঠ,* শুভম, ২০০৯ পৃ. ৮৩৩
৯. হোসেন, মীর মশারফ, *উদাসীন পথিকের মনের কথা,* দীপ প্রকাশন, ২০১০ পৃ. ৩৩
১০. হোসেন, মীর মশারফ, *উদাসীন পথিকের মনের কথা,* দীপ প্রকাশন, ২০১০ পৃ. ৩৩
১১. হোসেন, মীর মশারফ, *উদাসীন পথিকের মনের কথা,* দীপ প্রকাশন ২০১০ পৃ. ১১
১২. সেন, চন্ডীচরণ, *দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ,* বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি, ১৩০২ পৃ. ৫৮
১৩. সেন, চন্ডীচরণ, *মহারাজা নন্দকুমার,* ভিক্টোরিয়া প্রেস, ১২৯২ পৃ. ৩৮৮
১৪. দত্ত, অক্ষয়কুমার, ‘পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরাবস্থা’, *বাংলার জমিদার ও রায়তের কথা গ্রন্থ,* কমল চৌধুরী (সম্পা.) দে’জ পাবলিশিং, ২০১৯, পৃ. ৪৫
১৫. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম, ‘বঙ্গদেশের কৃষক’, *বাংলার জমিদার ও রায়তের কথা গ্রন্থ,* কমল চৌধুরী (সম্পা.) দে’জ পাবলিশিং, ২০১৯, পৃ. ১৮৭
১৬. দে, দ্য রেভারেন্ড লাল বিহারী, *গোবিন্দ সামন্ত,* ম্যাক মিলান এন্ড কোং লিমিটেড, ১৯১৬ পৃ. ৩২৩
১৭. দে, দ্য রেভারেন্ড লাল বিহারী, *গোবিন্দ সামন্ত,* ম্যাক মিলান এন্ড কোং লিমিটেড, ১৯১৬ পৃ. ৩২৪
১৮. সেন, চন্ডীচরণ, *মহারাজা নন্দকুমার,* ভিক্টোরিয়া প্রেস, ১২৯২ পৃ. ৩৮৮
১৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘রায়তের কথা’, *বাংলার জমিদার ও রায়তের কথা গ্রন্থ,* কমল চৌধুরী (সম্পা.) দে’জ পাবলিশিং, ২০১৯, পৃ. ২০৩